রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা

আধুনিক বাংলা কবিতার বিবর্তন

তরুণ মুখোপাধ্যায়

জীবন যেমন, কবিতাও তেমনি অন্তহীন, মৃত্যুহীন। অন্তত মানুষ ও মানবসভ্যতা যতদিন থাকবে, কবিতাও থাকবে। তাই বাংলা কবিতার বয়স হাজার বছর পার হলেও সে নিত্যনবীনা, রসময়ী, রহস্যময়ী। যথার্থ কবি ও সহৃদয় পাঠক-প্রেমিক ছাড়া তাকে ধরা যায় না। পেয়েও মনে হয় পাওয়া হল না। নারীর মতোই কবিতা স্পর্শপ্রিয়, আদরপ্রিয়। তার জন্য যে কষ্ট ভোগ করে, রক্ত ও অশ্রুপাত করে, তারই কাছে আসে কবিতা। তখন বুদ্ধদেব বসুর মতো বলতে হয় 'কবিতাই প্রেম'। কিংবা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলা যায়— 'শুধু কবিতার জন্য এই জন্ম।'

বাংলা কবিতার বিবর্তনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, আদি-মধ্য যুগের কবিতা মুখ্যত ছিল দেবতা, ধর্ম, আচার-আশ্রয়ী। 'রিচুয়াল' শব্দটি এ-ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়। চর্যাপদ থেকে মঙ্গলকাব্য— নবম-দশক শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত যার ব্যাপ্তি। তবে এ-কথাও সত্য, কবিরা কেবল আকাশচারী ছিলেন না, মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে পা-ও ফেলেছেন। তাই রক্তমাংসের মানুষের চাওয়া-পাওয়া, হাসি-কান্না, ক্রোধ-ক্ষোভ ও প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তাঁদের কবিতায়। আধুনিক কালে বাংলা কবিতার যে-সব ধারা দেখা যায়, মোটা দাগে তাকে প্রেমের কবিতা, রোমান্টিক কবিতা, ধ্রুপদী ভাবভঙ্গির কবিতা, সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার কবিতা, অন্তর্মুখী কবিতা ইত্যাদি নানা অভিধা দেওয়া যায়। নিজের সম্পর্কে সমালোচকদের দেওয়া অভিধা নিয়ে ক্ষুব্ধ জীবনানন্দ দাশ বলেছিলেন, তাঁর কবিতা অবিমিশ্রভাবে নির্জনতার বা নিশ্চেতনার কবিতা মাত্র নয়। তবু আলোচনার সুবিধার্থে আমরা কবিতার এই বিভাজন মেনে নিই।

যদি সূত্রাকারে বাংলা কবিতার বিবর্তন বা বাঁকবদল দেখাতে চাই তো বলতে হয়, আদি ও মধ্য যুগের কাব্যে দুটি ধারা সর্বদা বহমান ছিল— ধর্মাশ্রিত ও মানবাশ্রিত ধারা। আধুনিক কাব্যে ঈশ্বর গুপ্ত নিয়ে এলেন রিয়ালিস্ট কাব্যধারা। মধুসূদন দত্তের কাব্যে এল ক্লাসিসিজ্‌ম ও রোমান্টিকতা এবং ব্যক্তিহৃদয়ের প্রকাশ। বিহারীলাল চক্রবর্তী লিরিক কবির বাসনা-বেদনা যথাযথ ভাবে উন্মোচন করলেন। আর রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার রাজাধিরাজ— বর্ণময়, বৈচিত্র্যময় করলেন বাংলা কবিতা। যদিও তিনি ভাববাদী কবি। রবীন্দ্রোত্তর কবিকুল অতিরিক্ত বাস্তবতার নামে নিয়ে এলেন যৌনতা, কুশ্রীতা, অসুন্দরের নতুন ব্যাখ্যা। আঙ্গিকে ঘটল নানা পরিবর্তন। গদ্যকবিতা শুধু নয়, ছন্দের ভাঙাচোরা রূপ, স্তবকবিন্যাসে নিয়মলঙ্ঘন, শব্দ ও ভাষা প্রয়োগে বিপুল স্বাধীনতা তাঁরা নিলেন। তিরিশ থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত চলেছে এরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই একুশ শতকও সেই উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। খানিকটা old wine in a new bottle ধরনে। যদিও কবিদের সৌন্দর্য-সাধনা, রূপারতির ঐতিহ্য ম্লান হয়নি। চর্যাপদে শবর শবরীর রূপে উন্মাদ। আর বৈষ্ণব কবি বলেন, 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর/প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর'— তখন তা নিখিল নরনারীর আকুলতা হয়ে ওঠে। অবশ্য প্রাচীন বা মধ্য যুগ ব্যক্তি-কবির

যুগ। বৈষ্ণব কবিরা গোষ্ঠীচেতনাকে ধর্মীয় আশ্রয়ে ব্যক্ত করলেও কবিতার সঙ্গে তার যোগ নেই। চণ্ডীদাস কিংবা বিদ্যাপতি আপন মানসীর জন্যই বিরহমিলনগাথা রচনা করেছেন।

উনিশ শতকে ইউরোপীয় রেনেসাঁসের প্রভাবে বঙ্গদেশে নবজাগরণ সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতায় সুদূরপ্রসারী ছাপ ফেলেছিল। পয়ার-পাঁচালির নরম নিবিড় ছন্দে কবিতা লেখার কাল আর নেই, প্রথম বুঝেছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিটন সোসাইটি হলে বক্তৃতায় বলেছিলেন, ইংলন্ডীয় প্রথায় কবিতা লেখা ছাড়া বাংলা কবিতার মুক্তি অসম্ভব। নিজে তিনি পারেননি; পথ নির্দেশ করেছিলেন। মধুসূদন দত্ত সেই কবিপুরুষ যিনি দেশ-বিদেশের সাহিত্যফুলের মধু সংগ্রহ করে রচনা করেছিলেন 'মধুচক্র'— গৌড়জন যার আস্বাদে তৃপ্ত হয়েছিল। শুধু বিষয় ও বক্তব্য নয়, ছন্দে মধুসূদন যে-ভাঙাগড়ার কাজ করলেন, যে-অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করলেন তা পরবর্তীকালের বাংলা কবিতার সীমা প্রসারিত করে দিল। ছন্দ যে কবিতার প্রাণস্পন্দন সেটা কবিরা বুঝতে পারলেন। শুরু হল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পার হয়ে এই বিশ শতকের আশি-নব্বইয়ের দশকের কবিরা পর্যন্ত ছন্দের যে-কারুকার্য দেখিয়েছেন তার জন্য মধুসূদনের কাছে বাংলা কবিতা ঋণী।

কবিতা কবির জন্য, না কি পাঠকের জন্য— এই বিতর্ক বহুদিনের। বিহারীলাল চক্রবর্তী যখন আপনমনে, আপন সুরে কবিতা লিখলেন, রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল এই কবিতা নিভৃতে কান পেতে শোনার জন্য। স্বয়ং কবি ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর অনুভূতি ও মানসীকে "কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারি নে।" ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বা মধুসূদন দত্ত প্রমুখ কবি চেয়েছিলেন কবিতা সর্বজনগ্রাহ্য হোক। রবীন্দ্রনাথ 'গৃহের বনিতা'-কে 'বিশ্বের কবিতা' করে তোলার অঙ্গীকারে লিখেছিলেন,

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—

যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁর স্বরসাধনায় 'ফাঁক' রয়ে গেছে বলে তিনি আক্ষেপ করেছিলেন,

আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

উত্তর-রবীন্দ্রযুগের কবিরা এই রন্ধ্রপথে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিলেন।

কোনো একটি পত্রিকা যে কবিতাকে আন্দোলনের আশ্রয়ভূমি করতে পারে তার দৃষ্টান্ত 'কল্লোল' পত্রিকা। দীনেশচন্দ্র দাশ ও গোকুলচন্দ্র নাগের সম্পাদনায় ১৯২৩-এ যার আত্মপ্রকাশ। অবশ্য এর আগে প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'সবুজ পত্র' পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা গদ্যরীতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন ১৯১৬-তে। ছোট পত্রিকা অর্থাৎ লিট্‌ল ম্যাগাজিন যে সাহিত্য-আন্দোলনের হাতিয়ার তা সেই প্রথম লেখক ও পাঠকেরা টের পেয়েছিলেন। রাবীন্দ্রিক ঘরানাকে অস্বীকার করে বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত সঞ্চালনের দায়িত্ব নিয়েছিল 'কল্লোল' পত্রিকা। বাস্তবতা ও যৌনতা এবং সমাজের ইতর শ্রেণির মানুষের কথা বলার মুখপত্র হয়েছিল 'কল্লোল'। রবীন্দ্রপন্থা পরিত্যাগই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। যার সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত 'প্রগতি' (১৯২৭) পত্রিকা। নবীন প্রতিভা সন্ধানই ছিল লক্ষ্য। 'সবুজ পত্র' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথও একসময় প্রমথ চৌধুরীকে এই পরামর্শই দিয়েছিলেন—

লেখা সৃষ্টির চেয়ে লেখক সৃষ্টির বেশি দরকার।... নবীন লেখকেরা সবুজ পত্রের আদর্শকে ভয় পায়— তাদের একটু অভয় দিয়ে দলে টেনে নিয়ো, ক্রমে তাদের বিকাশ হবে।

বাংলা সাহিত্যপত্রিকা জগতে অভিনব, অভিজাত ও মননশীল পত্রিকারূপে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার নাম (প্রথম প্রকাশ ১৯৩১) অবশ্য উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানের পরিচয় দেওয়া। এ-ছাড়াও সেখানে প্রকাশিত হত ভালো গ্রন্থ-সমালোচনা, প্রগতিবাদী, যুক্তিবাদী প্রবন্ধ এবং দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস বিষয়ক নানা রচনা। এই পত্রিকাটিকে অনেকে ইংরেজি ডি-ক্রাইটেরিয়ান পত্রিকার সঙ্গে তুলনা করেছেন।

শুধু কবিতার জন্য উৎসর্গীকৃত পত্রিকা 'কবিতা'। প্রথমে বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্র যুগ্ম সম্পাদক হলেও পরে একা বুদ্ধদেব বসু এর প্রাণপুরুষ হয়ে ওঠেন। ১ অক্টোবর ১৯৩৫-এ 'কবিতা' পত্রিকার জন্ম। যা হয়ে উঠেছিল সেই সময়ের তরুণ কবিদের আঁতুড়ঘর। কবি অরুণকুমার সরকারের স্মৃতিচারণে জানা যায়,

কবিতা ভবনে দু'ঘণ্টা আড্ডা দিয়ে আসা মানে হাওয়া বদল করে আসা, উদ্দীপ্ত হওয়া, কবিতা লেখার প্রেরণা পাওয়া।

'কবিতা' পত্রিকার সঙ্গে যে-কোনো কারণেই হোক মন কষাকষির ফলে প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রকাশ করলেন (সঞ্জয় ভট্টাচার্যের

সহযোগিতায়) 'নিরুক্ত' পত্রিকা (১৯৪০)। পত্রপত্রিকায় যাঁরা কবিতা ছাপানো অবহেলার কাজ মনে করতেন, 'কবিতা' পত্রিকা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানিয়েছিল। 'স্বল্পসংখ্যক সুনির্বাচিত পাঠকের কাছে' কবিতা পৌঁছবে, এটাই ছিল প্রত্যাশা। আর 'নিরুক্ত' চেয়েছিল, এলিয়টীয় দুর্বোধ্যতার অনুসরণে বাংলা সাহিত্যের একদল 'বুদ্ধিজীবী' কবির বাংলা কবিতাকে 'অস্পৃশ্য' করে তোলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে।

কবিদের ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনা ও অনুভব প্রকাশের জন্য যে-সব পত্রিকা বিশ শতকের তিন বা চারের দশকে প্রকাশিত হয়েছিল সেগুলি ছিল প্রধানত কলাকৈবল্যবাদী। চল্লিশ বা চারের দশকে 'অরণি' (১৯৪১) পত্রিকা সমাজমনস্কতা ও রাজনৈতিক চেতনার পরিচয় বহন করেছিল। বাংলা প্রগতি-সাহিত্যের হোমানল এখানেই জ্বলেছিল। এই সেই পত্রিকা যেখানে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের ধারাবাহিক প্রকাশ ঘটে। ১৯৪৮-এ পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য সেই উত্তরাধিকার বহন করে 'অগ্রণী' (১৯৪৮) পত্রিকা। এখানে তরুণ সাহিত্যিকরা লিখতেন। দুটি পত্রিকাই প্রগতিবাদী সাহিত্য আন্দোলনের ভূমিকা পালন করেছিল। সেখানে কবি ও লেখকেরা ছিলেন গোলাম কুদ্দুস, রাম বসু, বিষ্ণু দে, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুধী প্রধান প্রমুখ। এই ধারার উত্তরাধিকার পরে বহন করেছিল 'কবিতা সীমান্ত' পত্রিকা ও তার কবিগোষ্ঠী।

তিরিশের কবিরা ভাব-ভাষা-ভঙ্গিতে চেয়েছিলেন অ-রাবীন্দ্রিক হতে। যে-জন্য তাঁরা বিদেশী কবিদের দ্বারস্থ হন। লরেন্স, হুইটম্যান, বোদলেয়ার, এলিয়ট, ইয়েট্‌স প্রমুখ কবিরা তাঁদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন। চল্লিশের কবিরা রাজনৈতিক প্রজ্ঞাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পরাধীনতার যন্ত্রণা থেকে কৃষক আন্দোলন— তাঁদের স্বপ্নলোক থেকে বাস্তব পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছিল, যেখানে 'কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া'। অবশ্য এই চল্লিশেই আমরা পেয়েছি স্বপ্নালু কবি অরুণ কুমার সরকার কিংবা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকেও। আছেন মণীন্দ্র রায়, যিনি দীর্ঘকবিতার এক ঐতিহ্য তৈরি করেছিলেন। অবশ্য পরে বাংলা কবিতায় নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যে-নতুন বাগ্‌ভঙ্গি ও আঙ্গিক এনেছিলেন তা পরবর্তী দশকের কবিদের অনুপ্রাণিত করেছে। কবিতায় গল্পের উপাদান কিংবা কাহিনির আভাস আনা, ঋজু গদ্যছন্দ প্রয়োগ, ঘরোয়া ও চেনা জীবনের ভগ্নাংশ চিত্রিত করার মধ্যে নীরেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব বোঝা যায়। তাঁর 'উলঙ্গ রাজা' কিংবা 'কলকাতার যীশু' প্রবাদপ্রতিম হয়ে আছে। আমার মনে হয়, সত্তরের কবি সুবোধ সরকার অগ্রজের এই উত্তরাধিকার তাঁর কবিতায় বহন করছেন (নিকানোর পারা-র কথা মনে রেখেও বলব)।

কবি ও কবিতা কখনো দেশ-কাল-সমাজ বিবিক্ত হতে পারে না। ঘটনাপ্রবাহ কবি ও কবিতাকে তীব্রভাবেই স্পর্শ করে। সুতরাং স্বাধীনতা লাভের কাল থেকে ২০০৭ পর্যন্ত যে-সব ঘটনা উল্লেখযোগ্য তার বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া বাঞ্ছনীয়, যার থেকে আমরা ধরে নিতে পারব, কবিরা কোন্ সময়ের অভিঘাতে চঞ্চল হয়েছেন এবং কবিতা কোন্ দিগ্‌দর্শন রচনা করেছে। আপাতত দশ বছরের ঘটনাপঞ্জি দেওয়া গেল।

১৯৪৬ — হায়দরাবাদে তেলেঙ্গানা আন্দোলন শুরু।
নৌ-বিদ্রোহ।
ছেচল্লিশের কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৬ আগস্ট)।

১৯৪৭ — দিনাজপুরের চিরির বন্দরে কৃষক মিছিলে গুলিচালনায় তেভাগা আন্দোলনের প্রসার।
ভারত ভাগ হল ১৪ আগস্ট; পাকিস্তান স্বতন্ত্র রাষ্ট্র।
ভারতের স্বাধীনতা লাভ ১৫ আগস্ট।

১৯৪৮ — ৩০ জানুআরি আততায়ীর হাতে মহাত্মা গাঁধীর মৃত্যু।
অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি বলে ঘোষিত হল।
কাকদ্বীপ আন্দোলনে অহল্যা শহিদ হলেন।

১৯৪৯ — চিনে মাও-সে-তুঙের নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।
বাংলায় উদ্‌বাস্তুদের উপর গুলিচালনা।
রেল ধর্মঘট।

১৯৫০ — কোরিয়ায় যুদ্ধ শুরু।
২৬ জানুআরি ভারতের সংবিধান প্রকাশিত হল।
জাতীয় সংগীত রূপে গৃহীত হল বন্দেমাতরম ও জনগণমন অধিনায়ক।
বর্গাদার আইন প্রণয়ন ও পাশ।
শ্রীঅরবিন্দের জীবনাবসান।
সতীনাথ ভাদুড়ী 'জাগরী' উপন্যাসের জন্য প্রথম রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন।

১৯৫১ — পূর্ববঙ্গে বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষা করার দাবি।
কোচবিহারে ভুখামিছিলে গুলি।

তেলেঙ্গানায় সশস্ত্র আন্দোলনের সমাপ্তি, মৃত অসংখ্য কমিউনিস্ট।
ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন ঘোষিত হল।
প্রকাশিত হল 'শতভিষা' কবিতাপত্র।

১৯৫২ — পূর্ববঙ্গে (অধুনা বাংলাদেশ) মাতৃভাষা বাংলার জন্য আন্দোলন ও ছাত্রদের প্রাণদান।
বলিভিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হল।

১৯৫৩ — স্ট্যালিন মারা গেলেন।
তেনজিং নোরগে ও এডমন্ড হিলারি এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করলেন।
কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের উদ্‌বোধন হল।
ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে বামপন্থীদের তীব্র আন্দোলন।
বার্নপুরে শ্রমিকদের উপর গুলিবর্ষণ ও সাত জনের মৃত্যু।
তরুণ কবিদের মুখপত্ররূপে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রকাশ।

১৯৫৪ — ১০ ফেব্রুআরি প্রথম শিক্ষক ধর্মঘট।
কবি জীবনানন্দের দুর্ঘটনায় মৃত্যু।

১৯৫৫ — ভারতবর্ষ জুড়ে শিল্প ধর্মঘটের প্রসার।
ভূমি সংস্কার বিল পেশ হল।
প্রথম সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার দেওয়া হল (মরণোত্তর) জীবনানন্দ দাশকে।

এখানে মাত্র দশ বছরের সালতামামি দিলাম, এ-জন্যই, প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব থেকে স্বাধীনতা লাভের পর বাকি আট বছর দেশ-কাল কেমন ছিল তার ধারণা দিতে। এই দশ বছরে যে-সব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তারও নির্বাচিত তালিকা দেওয়া যায়।

১৯৪৭ — বিষ্ণু দে : সন্দীপের চর
সুকান্ত ভট্টাচার্য : ছাড়পত্র
অজিত দত্ত : পুনর্নবা

১৯৪৮ — কৃষ্ণ ধর : অঙ্গীকার
জীবনানন্দ দাশ : সাতটি তারার তিমির
বুদ্ধদেব বসু : দ্রৌপদীর শাড়ি
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় : তেলেঙ্গানা ও অন্যান্য কবিতা
সুভাষ মুখোপাধ্যায় : অগ্নিকোণ

১৯৫০ — অন্নদাশঙ্কর রায় : রাঙা ধানের খৈ
অসীম রায় : ফুটপাতে ফুলের গন্ধ
আলোক সরকার : উতল নির্জন
বিষ্ণু দে : অন্বিষ্ট
রাম বসু : তোমাকে
সুভাষ মুখোপাধ্যায় : চিরকুট

১৯৫৩ — অমিয় চক্রবর্তী : পারাপার
আনন্দ বাগচী : স্বগত সন্ধ্যা
গোলাম কুদ্দুস : ইলা মিত্র
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : সংবর্ত
বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত : আধুনিক বাংলা কবিতা

১৯৫৪ — অরবিন্দ গুহ : দক্ষিণ নায়ক
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : নীল নির্জন
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : উলুখড়ের কবিতা
রাম বসু : যখন যন্ত্রণা
সমর সেন : সমর সেনের কবিতা
গণেশ বসু : বনানীকে কবিতাগুচ্ছ

১৯৫৫ — অরুণ মিত্র : উৎসের দিকে
অমিয় চক্রবর্তী : পালাবদল
বুদ্ধদেব বসু : শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর
মণীন্দ্র রায় : কৃষ্ণচূড়া
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : প্রতিধ্বনি

১৯৫৬ — প্রেমেন্দ্র মিত্র : সাগর থেকে ফেরা
তরুণ সান্যাল : মাটির বেহালা
বিমলচন্দ্র ঘোষ : উদাত্ত ভারত
শঙ্খ ঘোষ : দিনগুলি রাতগুলি
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : লখিন্দর
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : দশমী

এই নির্বাচনও পাখির চোখে। কিন্তু এখান থেকে এটুকু ধারণা করতে পারি, কবিরা স্বাধীনতা-উত্তরকালে কাব্যবিষয়কে কত বিচিত্র ভাবে গ্রহণ করেছেন। যে-বিষয়ভাবনায় মিশে আছে ব্যক্তিক প্রেম, রোমান্স, রোমান্টিকতা, দূরাভিসার, সমাজ, আন্তর্জাতিক বোধও। সকলেই স্বভাবত স্বতন্ত্র। এঁরাই ষাট বছরের বাংলা কবিতায় অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। আরও এক দশকের

সালতামামি নিলে পাওয়া যাবে সেইসব কবিদেরও যাঁরা একদিন কলকাতা শাসন করেছেন মধ্যরাতে।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে দিনকাল, পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। যুদ্ধ, চক্রান্ত, মারণাস্ত্র ইত্যাকার কাণ্ডের সঙ্গে প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতি বা অগ্রগতি ঘটেছে। যার প্রভাব পড়েছে সংবেদনশীল কবিদের লেখায়। সত্তর থেকে নব্বইয়ের দশকের কিছু ঘটনার উল্লেখ করা যায়। অবশ্য ষাটের দশকেই নকশাল আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়েছিল। সাহিত্যে শুরু হয়েছিল হাংরি আন্দোলন।

কবিতার মর্যাদা দেবার জন্য লড়াই শুরু করেছিল 'কবিতা' পত্রিকা (১৯৩৫)। সেই পদাঙ্ক অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে বেশ কিছু সাহিত্যপত্রিকা কবিতার জন্য বেঁচে থাকার এক আশ্চর্য উন্মাদনা তৈরি করেছিল। আপাতশান্ত বাংলা কবিতার মন ও মেজাজের পক্ষে তা যেন হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো মনে হয়েছিল পাঠক ও সমালোচকদের কাছে। প্রধানত পঞ্চাশ বা পাঁচের দশকেই এই ধরনের আন্দোলন ঘনীভূত হয়েছিল। 'শতভিষা' ও 'কৃত্তিবাস' এই দুটি পত্রিকা তারুণ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

১৯৫১-তে 'শতভিষা' পত্রিকা প্রথম প্রকাশ পায়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, যথাযথ ও রসোত্তীর্ণ কবিতা ছাপা হবে। কোনো ইজ্‌ম বা মতবাদলালিত কবিতায় এই পত্রিকার আস্থা ছিল না। সম্পাদক রূপে আলোক সরকার পরে বলেছিলেন, "আমরা কবিতাকে আবার কবিতার কাছে ফিরিয়ে আনব" এই ছিল 'শতভিষা'-র শর্ত। শতভিষা-র ৩৩ সংখ্যায় বলা হল—

তিরিশের কবিদের যৌনকাতরতা, মূল্যবোধে অনাস্থা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অতিরিক্ত সমাজভাবনা, তরল কাব্যময়তা ইত্যাদি আপাত লক্ষণগুলি যে আর ব্যবহৃত হবার নয়, এ সত্য অভ্রান্ত জেনে বাংলা কবিতার মুক্তির জন্য 'শতভিষা' প্রয়োজন অনুভব করেছিল নতুন পথ সন্ধানের।

পঞ্চাশের প্রায় সমস্ত কবিকেই আমরা শতভিষা-র পাতায় পাতায় দেখি। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, শঙ্খ ঘোষ, তারাপদ রায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার প্রমুখ উল্লেখ্য। ষাটের কবিরাও এখানে লিখেছেন। যেমন, সামসুল হক, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, রত্নেশ্বর হাজরা, পুষ্কর দাশগুপ্ত, পরেশ মণ্ডল, রাণা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সঞ্জয় ভট্টাচার্যও এখানে কবিতা লিখেছেন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে কবিতার কাগজ 'শতভিষা' হয়ে উঠেছিল কবিদের মুখপত্র।

উত্তর-তিরিশ তথা উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে লেখা কবিতাগুলি কেমন ছিল তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়।

১. *প্রভু, যদি বলো, অমুক রাজার সাথে লড়াই*
কোনো দ্বিরুক্তি করব না; নেবো তীর-ধনুক।
এমনি বেকার; মৃত্যুকে ভয় করি থোড়াই;
দেহ না-চললে, চলবে তোমার কড়া চাবুক।
(প্রস্তাব/সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

২. *আমেরিকা ভালো, চীন ভালো...*
স্ট্রম্যান পাঠাবে অন্ন আমাদের কাল
হৃদয় জুড়ালো।
(মুখোশ/বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

৩. *সিন্দুক নেই; স্বর্ণ আনিনি,*
এনেছি ভিক্ষালব্ধ ধান্য।
ও দুটি চোখের তাৎক্ষণিকের
পাবো কি পরশ যৎসামান্য?
(জন্মদিনে/অরুণকুমার সরকার)

৪. *আমার দিনমান আপনমনে শুধু মনের পথ হাঁটা*
আমার সারারাত মনের তারাভরা আকাশে তারা গোনা
এমনই লোকে লোকারণ্য সংসার আমি ছিলাম একা,
ঘরের কোণে ছিলো একটি মুখ সে-ই আমার ভালোবাসা।
(আমার ভালোবাসা/মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

৫. *গণক প্রেমিক ভিক্ষুকে গুলজার*
রূপসী শহর— কোথায় আরশি তার?
(আরশিনগর/রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী)

৬. *দিন ভরে ওঠে স্বাদে, ভরে রাত,*
তুমি কাছে নাই।
বসন্তের জানালায় মাঘের রাতের শীত
একলা পোহাই।
(মাঘ শেষ হয়ে আসে/নরেশ গুহ)

৭. *না, সে নয়। অন্য কেউ এসেছিলো। ঘুমো, তুই ঘুমো।*
এখনো রয়েছে রাত্রি, রোদ্দুরের চুমো
লাগেনি শিশিরে।
(সহোদরা/নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)

৮. *ওই যে সাগর স্রোতের মতন মুক্তির ঢেউ আসে*
বাঁধ কেটে দাও বাঁধ কেটে দাও আর কোন ভয় নেই
উত্তরমেঘে আশ্বাস পাই পৃথিবী যে আমাদের।

প্রবঞ্চনার মরীচিকা মুছে তলোয়ার হয়ে জ্বলি
প্রাচীন দেওয়ালে কুঁদে লিখে রাখি ঘৃণার গায়ত্রী।

(উত্তর মেঘ/রাম বসু)

৯. *ঘটনা হিশেবে আত্মহত্যা অতীব মুখ্য।*
পরলোক বলে যদি কিছু থাকে
তুই যা হারালি পাবি না তো তাকে—
আর কার, বল, তোর দুঃখের তুল্য দুঃখ।

(মূল্য/অরবিন্দ গুহ)

১০. *রমণী তার জানলা খুলবে না কোনদিন*
অর্থাৎ নয়ন,
পাছে এমন কিছু সে দেখে ফেলে
যা তার চেয়েও সুন্দর, অর্থাৎ রমণীয়।

(শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়)

১১. *সব তো ঠিক করাই আছে। এখন কেবল বিদায় নেওয়া,*
সবার দিকে চোখ,
যাবার বেলায় প্রণাম, প্রণাম!

(ছুটি/শঙ্খ ঘোষ)

১২. *হয়তো সেই শুকসারী ছাদের উপর এসেছিলো।*
সেই মুহূর্তেই যদি দরজা খুলতে তবে
তারা বলে দিত ঠিক পুবে না উত্তরে যেতে হবে।
ছাদের কার্নিশে দুইজনে
তোমার অপেক্ষা করে ক্লান্ত খুব দুঃখ পেয়েছিলো।

(অন্তরালে/আলোক সরকার)

১৩. *বলেছ প্রস্তুত থাক আমি এসে নিয়ে যাব তোকে*
সেই থেকে বসে আছি সব কাজ ব্যর্থ অবসান

(উন্মেষ/সুধেন্দু মল্লিক)

১৪. *তুমি যে বলেছিলে রাত্রি হলে*
মুখোশ খুলে দেবে বিভোর বিভা,
অহংকার ভুলে অরুন্ধতী
বশিষ্ঠের কোলে মূর্ছা যাবে!
রাত্রি হলো।

(একটি কথার মৃত্যুবার্ষিকীতে/অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত)

১৫. *আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে, সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ*
দীর্ঘ দাঁতের করাত ও ঢেউ নীল দিগন্ত সমান করে
বালিতে আধ-কোমর বন্ধ
এই আনন্দময় কবরে
আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ।

(এক অসুখে দু'জন অন্ধ/শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

১৬. *...নীরা, আমি তোমার অমন*
সুন্দর মুখে বাঁকা টিপের দিকে চেয়ে থাকবো। আমি
অন্য কথা
বলার সময় তোমার প্রস্ফুটিত মুখখানি আদর করবো
মনে মনে
ঘরভর্তি লোকের মধ্যেও আমি তোমার দিকে
নিজস্ব চোখে তাকাবো।

(নীরার জন্য কবিতার ভূমিকা/সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

১৭. *অভিজ্ঞতা থেকে ক্রমে আকাশের বর্ণহীনতার*
সংবাদের মতো আমি জেনেছি তোমাকে; বাতাসের
নীলাভতা হেতু দিনে আকাশকে নীল মনে হয়।
বালুময় বেলাভূমি চিত্রিত করার পরেকার
তরঙ্গের মতো লুপ্ত, অবলুপ্ত তুমি, মনোলীনা।

(আমার ঈশ্বরীকে/বিনয় মজুমদার)

১৮. *ভাঙা ঘরে, মস্ত একটা হাওয়ায়*
মানুষ কাঁপছে;
একটা হাত পাশের মানুষীকে
ধরে আছে, আরেকটা হাত
কোথায় রাখবে— বুঝতে পারছে না,
পায়রা এসে বসেছে নিমগাছে।

(মানুষ, ১৯৬১/প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত)

ইতস্ততভাবে নেওয়া কবিতাংশগুলি সচেতন ও শিক্ষিত পাঠককে স্বীকার করতে বাধ্য করবে, এগুলি একেবারে অন্য ছাঁদের, অন্য স্বাদের কবিতা। বাংলা কবিতার বহমান ধারা লক্ষ করলে আমরা দেখি, ধর্মীয় বা ভক্তিরসের কবিতার পর্ব শেষ হলে বাঙালি কবিরা গীতিকবিতার 'intense personal feelings'-কে গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথই ব্যতিক্রমী, যিনি ব্যক্তিগতকে বিশ্বগত করে তুলেছিলেন। তাঁর 'আমি' একক নয়; বহু। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিরা আবার ব্যক্তি-আমির বন্দনায় মুখর হলেন। গোবিন্দচন্দ্র দাস বললেন— " আমি তারে ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ।" বুদ্ধদেব বসু লিখলেন, "আমি যে রচিব কাব্য এ উদ্দেশ্য ছিলো না বিধাতার।" আর জীবনানন্দ দাশের কবিতায় পেলাম এই উচ্চারণ : "হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে।"

চল্লিশের কবিদের কবিতার মূল সুর সমাজগত; নির্দিষ্ট করে বললে, তার সুর রাজনৈতিক। সুভাষ-সুকান্ত-বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-রাম বসু প্রমুখের কবিতা যার দৃষ্টান্ত। তবে তাঁরা যে প্রেমের কবিতা লেখেননি, রোমান্টিক জগৎ থেকে দূরে ছিলেন এটাও সত্য নয়। বরং প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যভাবনার সঙ্গে এঁদের কাব্যাদর্শ যেন প্রতিতুলিত হতে পারে। যিনি একদিকে বলেন,

ছোট এই আশা, সুখ
ঈর্ষা করি না, ঘৃণা নহে ভাই, শুধু নহি উৎসুক।

(সুদূরের আহ্বান)

অন্যদিকে তিনি লেখেন,

খেয়ার নায়ে, ওপারে যেতে কবে যে কোন্ ভিড়ে
একটা মুখ এক নিমেষে ওকূল স্রোতে ভাসায়।
কার সে মুখ, কার?

(মুখ)

চল্লিশের অরুণ সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, নরেশ গুহ প্রমুখের কবিতায় পাই রোমান্টিক বেদনা ও স্বপ্নচারিতা। মেধা ও প্রজ্ঞার আশ্চর্য সম্মিলন ঘটেছে রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরীর কবিতায়।

পঞ্চাশের কবিরা কবিতাকে আত্মগত করে তুললেন। আত্মসমীক্ষা, আত্মবিলাপ, আত্মকথা হয়ে উঠল তাঁদের কবিতার বিষয়। পাশাপাশি কারও কবিতায় পাই দৃশ্যমুগ্ধতা, আত্মদর্শন। কেউ কেউ সমাজ ও রাজনীতি প্রসঙ্গ উপজীব্য করেছেন এও দেখা যায়। যেমন, কবি তরুণ সান্যাল, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমুখ। এরই পাশে আস্তিক্যবাদী কবিতার আধুনিক মেজাজ পাওয়া যায় অলোকরঞ্জন বা সুধেন্দু মল্লিকের কবিতায়।

কালগত দিক থেকে দেখলে ষাট বা ছয়ের দশককে আলাদা গুরুত্ব দিতে হয়। শুধু কবিতার জন্য এই দশক জুড়ে যে-আন্দোলন হয়েছে তা ঐতিহাসিক ও স্মরণীয়। অন্তত চারটি আন্দোলন উল্লেখযোগ্য— হাংরি জেনারেশন, শ্রুতি, ধ্বংসকালীন ও প্রকল্পনা। এর মধ্যে প্রথম দুটি আন্দোলন ব্যাপকতা পেয়েছিল।

১৯৬২-র এপ্রিলে মলয় রায়চৌধুরী যে-বুলেটিন প্রকাশ করলেন তার মাধ্যমে হাংরি আন্দোলনের মেজাজ ধরা পড়ল। মোট চোদ্দটি ভাবনাসূত্র ছিল সেই ইস্তাহারে। যার মধ্যে কয়েকটি এইরকম—

1. The merciless exposure of the self in its entirety.
2. To present in all nakedness all aspects of the self and thing before.
3. To challenge every value with a view to accepting or rejecting the same.
4. Not to take reality as it is but to examine it in all its aspects.
5. To use the same words in poetry as are used in ordinary conversation.
6. To reject traditional forms of poetry and allow poetry to take its original forms.
7. Personal ultimatum.

হাংরির কবিদের সম্পর্কে এই প্রচার শুরু হল, তাঁরা অশ্লীলতার সপক্ষে এবং সুস্থ সংস্কৃতির পরিপন্থী। ফলে কোর্ট-পুলিশ পর্যন্ত ব্যাপার গড়ায়। রিপোর্টে বলা হয়, হাংরিরা চেয়েছেন 'to corrupt the minds of the common reader.' ফলে গ্রেপ্তার হন মলয় রায়চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, দেবী রায় প্রমুখ।

প্রথাগত কবিতালেখা ও কাব্যভাবনার শুচিশীলিত পরিমণ্ডল ছিঁড়তে চেয়েছিলেন হাংরি গোষ্ঠীর কবিরা। যৌনতা প্রচার বা পর্নোগ্রাফি লেখা আদৌ তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল না। কবিতাকে উলঙ্গ করে দেখতে ও দেখাতে চেয়েছিলেন। যা তৎকালে পাঠকের কাছে ছিল 'শকিং' অভিজ্ঞতা। মলয় রায়চৌধুরীর বিতর্কিত ও নিষিদ্ধ কবিতা 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' থেকে কয়েক পঙ্‌ক্তি পড়া যাক—

অথচ আমি চেয়েছিলুম আলেয়ার নতুন জবার মতো
যোনির সুস্থতা
যোনিকেশরে কাচের টুকরোর মতো ঘামের সুস্থতা
আমি মগজির শরণাপন্ন বিপর্যয়ের দিকে চলে এলুম
আমি বুঝতে পারছি না কিজন্য আমি বেঁচে থাকতে চাইছি

হাংরি গোষ্ঠীর অন্যান্য কবিদের রচনাংশ এ-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যায়, যা চিনিয়ে দেয় বাংলা কবিতার স্বাধীনতা-উত্তর গতিপ্রকৃতিকে।

১. *চলে যাবে বিদেশে জাহাজ*
আমি ঐ অ্যালুমিনিয়মের মত সবল চৌকাঠে
যৌনাঙ্গ ঘষে পড়ে যাব
আজ আমি পরিশ্রমের দাম চাই

(শৈলেশ্বর ঘোষ)

২. *ভালোবাসা ও সততার বদলে পৃথিবীর লাথি*
চমৎকার— ভালো, খুবই ভালো, দারুণ পৃথিবী
মধুময়, অমৃত
পাপী ও বিশ্বাসঘাতিনীদের মধুময় বলে যেতে হবে নাকি?
(সুবো আচার্য)

৩. *অণুকোষের ভয়াবহতা জরায়ুর হিংস্রতার কাছে কিছুই নয়*
এই সত্য জানা গ্যালে পর কেন কাঁদতে হয়—
নির্বাসিত উজ্জ্বল দ্বীপে বসে
আমি কাঁদছি আমি হাসছি
(দেবী রায়)

কবি ও প্রাবন্ধিক উত্তম দাশ মনে করেন, "হাংরি রচনায় ব্যক্তিই সব গল্প কবিতার মূলসূত্র।" (দ্র. হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন)। মলয় রায়চৌধুরীর মতে, আত্মার ইরিটেশন থেকে হাংরি কবিতার জন্ম।

১৯৬৫ সালের এপ্রিলে জন্ম নেয় 'শ্রুতি' পত্রিকা। উদ্যোক্তা পুষ্কর দাশগুপ্ত; প্রকাশক মৃণাল বসুচৌধুরী। প্রথম সংখ্যায় শ্রুতি-কবিতা প্রসঙ্গে জানানো হয়— "জৈব আর্তনাদ কিংবা সমাজচিন্তার স্থান যেখানেই হোক, কবিতায় নয়।" কবিকে শিক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। এ-ছাড়া ইস্তাহারে লেখা হয়—

১. কোনোরকম ব্যাখ্যা, বিধান বা তত্ত্ব প্রচারের দায়িত্ব কবিতার নেই।
২. চিৎকার বা বিকৃতি এর কোনোটাই কবিতা নয়।
৩. কবিতা হবে ব্যক্তিগত মগ্ন এবং একান্তই অন্তর্মুখী।
৪. আমরা বিশ্বাস করি কবিতা হয়ে ওঠা ছাড়া কবিতার আর কোনো চেষ্টা বা উদ্দেশ্য নেই।
৫. কবিতার একমাত্র অবলম্বন কবি/ব্যক্তির বিশেষ মানসিকতা এবং আন্তরিক অভিজ্ঞতা।
৬. ছেদচিহ্নের বিলোপ। কবিতার ভাষা হবে মুখের ভাষার সদৃশ।
৭. প্রচলিত ছন্দকে বর্জন ক'রে বা ভেঙে কবিতার ভাষায় ব্যক্তিগত উচ্চারণের স্বতন্ত্র স্পন্দন সৃষ্টি।
৮. কবিতার বিন্যাসে মুদ্রণের গুরুত্ব দিতে হবে, যাতে তা দৃষ্টিগ্রাহ্য ও উপলব্ধির সহায়ক হয়।

বিভিন্ন সংখ্যায় যে-সব ভাবনা শ্রুতি-র কবিরা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তার থেকে নির্বাচিত আটটি সূত্র দেওয়া হল, যার দ্বারা বাংলা কবিতার রূপ-রূপান্তর চেনা যায়। শ্রুতি আন্দোলনে যুক্ত কবিরা হলেন— পুষ্কর দাশগুপ্ত, মৃণাল বসুচৌধুরী, পরেশ মণ্ডল, অনন্ত দাশ, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অতীন্দ্রিয় পাঠক প্রমুখ। এঁদের কবিতার কিছু দৃষ্টান্ত দিই।

১. রাস্তা
বাস
ট্রাম
গাড়ী *(পুষ্কর দাশগুপ্ত)*

২. এ
কা
কী
প্র তি ধ্ব নি
নী
র
ব
জ্যোৎস্নায় *(পরেশ মণ্ডল)*

৩. কলঘরে জল ঢালার শব্দ—
তারপর
বারান্দায় স্লিপারের শব্দ—
তারপর
শোবার ঘরে পাউডারের গন্ধ—
আমার সিগারের গন্ধ ঢেকে দিচ্ছে। *(সজল বন্দ্যোপাধ্যায়)*

৪. এখনো তোমার দিকে চেয়ে
আমি রাত দিন
সমস্ত যন্ত্রণা আর
অবিরল সমুদ্রের স্বর ভুলে আছি। *(মৃণাল বসুচৌধুরী)*

৫. এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে
কয়েকটি ভৌতিক ঘোড়া
দরজা খুললেই তারা দৌড়বে এক একদিকে
নানা রঙে আর রেখায়
আমার কাজ হবে তাদের অনুসরণ করা
(অশোক চট্টোপাধ্যায়)

এইসব কবিতা অবশ্যই তত্ত্ব বা তথ্য নিয়ে আসে না অনুভূতি আর দৃশ্যময়তা তৈরি করে স্বতন্ত্র কবিতার ভুবন

১৯৬৬-তে ধ্বংসকালীন কবিতা আন্দোলন শুরু হয় 'সাম্প্রতিক' পত্রিকায়। যাঁরা চেয়েছিলেন—

১. প্রকৃতির মতো উদার আর অকৃত্রিম হবে কবিতা
২. কবিতাই কবির জীবনদর্শন হবে
৩. ঐতিহ্য মেনেই নতুন বোধে উত্তরণ ঘটাতে হবে
৪. প্রজ্ঞাময় আত্মবোধের স্বনির্ভর উচ্চারণে বিশ্বাস
৫. ধ্বংসকালীন আসলে সৃষ্টিকালীন।

এই নব্য কাব্যভাবনার অংশীদার ছিলেন সুকোমল রায়চৌধুরী, প্রভাত চৌধুরী, অঞ্জন কর, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র মুখোপাধ্যায়, দীপেন রায় প্রমুখ। এঁরা যেভাবে কবিতা লিখতে চেয়েছিলেন তার কিছু উদাহরণ—

১. *বীভৎস জ্যোৎস্নায় কারা হরিধ্বনি দ্যায়*
কারা যেন কবরে কবরে ভিড় করে
প্রেতাত্মার পাশাপাশি আমি হাঁটি সুড়ঙ্গের পথে

(প্রভাত চৌধুরী)

২. *প্রচণ্ড কম্পনে*
নিভে যায় পৃথিবীর
বুকের মশাল
লণ্ডভণ্ড পাঁজরের হাড়

(সুকোমল রায়চৌধুরী)

কবিতার আঙ্গিক নিয়ে প্রকল্পনা কবিতা আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬৯-এ। ভট্টাচার্য চন্দন এর প্রবর্তক। 'স্বতোৎসার' পত্রিকায় এঁদের বক্তব্য এইভাবে প্রকাশিত হয়েছিল—

১. প্রচলিত কোনো নির্দিষ্ট ফর্মে বিশ্বাসী নই আমরা।
২. প্রথার শৃঙ্খল থেকে রোদনার্ত সাহিত্যকে মুক্ত করতে চাই প্রকল্পনা আন্দোলনের মাধ্যমে।
৩. সাহিত্য হবে স্বতোৎসারিত অনুভব ও চৈতন্য প্রবাহের যথার্থ রেকর্ড (Automatic writing)।
৪. আমাদের লক্ষ্য শব্দের সীমানা অতিক্রম।
৫. জীবন সম্পর্কে কোনো কথাই শেষ কথা নয়।

এই কাব্যান্দোলনে যুক্ত ছিলেন উত্তর বসু, দিলীপ গুপ্ত, তপন ঘোষ, শুক্লা মজুমদার প্রমুখ। দুজন কবির কবিতাংশ উদ্ধৃত করে প্রকল্পনা গোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীণ কবিতা আন্দোলনের রূপটি দেখানো যেতে পারে।

১. *পৃথিবীর তাবৎ বাজারে ওৎ পেতে থাকে*
অভিজ্ঞ ফোড়ের চোখ
শুধু চোখে
দর ওঠে দর নেমে যায়—
যে জানে
শরীর পেতে তুলে নেয় প্রেম।

(উত্তর বসু)

২. *এ্যাইও উজবুক চুপচাপ থাকবে*
আগুন নিয়ে খেল্লেই মরবে
তবেই না সব চলছে চলবে

(ভট্টাচার্য চন্দন)

বাংলা কবিতা বাঁধা পথ ছেড়ে চলে যেতে চায় অন্য কোনো পথে, এ-সবই তার দৃষ্টান্ত। যদিও প্রশ্ন থাকে, এইসব কাব্য-আন্দোলন যতটা নাড়া দেয়, প্রাণে সাড়া দেয় কি না। চোখ ভোলাবার, মন দোলাবার আয়োজন থাকলেও কবিতার সেই নান্দনিক বোধ সর্বদা মেলে না এও সত্য।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'কবিপত্র'ও নতুন একটা কাব্যান্দোলন তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যার নাম ছিল 'থার্ড লিটারেচার'। পূর্ববর্তী কবি ও কাব্যান্দোলনের বক্তব্যই নতুন করে তাঁরা বলেছেন। তথাকথিত কবিতার আভিজাত্য অস্বীকারই এঁদের লক্ষ্য। কিন্তু কবিতা যে মানুষের জন্য, পাঠকের জন্য—এই সত্য তাঁরাও মেনেছেন।

প্রচারের আলোয় মাখা বড় কবি না-হলেও কবি কেষ্ট চট্টোপাধ্যায় 'শ্রমিক কবি' অভিধায় তৃপ্ত। কেননা দুর্গাপুরের কারখানায় হাতেকলমে তিনি শ্রম করেছেন। তাঁর মতাদর্শ বামপন্থী। কিন্তু অন্ধ আনুগত্য নেই। যেজন্য তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে লিখতে পারেন সেই কাব্য যার নাম "কমরেড, লাইনটা সোজা করুন।" রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মাঝখানে এই সতর্কবাণী এক কবির বিবেকী ও সামাজিক ভূমিকা স্পষ্ট করে নিশ্চয়।

ষাটের দশকের উপান্তে এ-দেশে যে নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা পরিপূর্ণতা পায় সত্তরের দশকে। প্রধানত কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে দাবি আদায়ের জন্য এই লড়াই শুরু হয়। কিন্তু ক্রমে তা অপশাসন, শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও সংগ্রামের রূপ নেয়। 'খতম অভিযান' সারা পশ্চিমবঙ্গে আতঙ্ক সৃষ্টি করে। বহু যুবক মারা যায়। পুলিশ তাদের হত্যা করে। এক নতুন পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়ার অঙ্গীকার নকশালবাড়ি আন্দোলনের লক্ষ্য হলেও শেষ পর্যন্ত তা পথভ্রষ্ট হয়। কিন্তু বিপ্লবের এই লাল আগুন ছড়িয়ে পড়ে শহরে ও গ্রামে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৭-এর মধ্যে দেশজুড়ে

4

কী কী ঘটনা ঘটেছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যায়।

১৯৬৭ — আরব-ইজরায়েলের যুদ্ধ। নিহত হন চে গুয়েভারা।
নকশালবাড়ি আন্দোলনের সূচনা।
যুক্তফ্রন্টে ভাঙন।

১৯৬৯ — চাঁদে নিল আর্মস্ট্রংদের প্রথম পদার্পণ।
হো চি মিন মারা গেলেন।
CPI (ML) দলের প্রতিষ্ঠা।
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠন।

১৯৭০ — যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ও দেশজুড়ে অস্থিরতা।
রাষ্ট্রপতির শাসন।
খতমের রাজনীতি। মূর্তিভাঙা।
নকশাল আন্দোলনের ব্যাপকতা।

১৯৭১ — নতুন বাংলাদেশের জন্ম।
পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীর ভিড়।
রাষ্ট্রপতি শাসন জারি পশ্চিমবঙ্গে।
নকশাল আন্দোলন তীব্রতর।

১৯৭৪ — ভিয়েতনামে যুদ্ধ।
ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘট।
জয়প্রকাশ নারায়ণ-এর সর্বাত্মক বিপ্লবের আহ্বান।

১৯৭৫ — বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান নিহত হলেন।
দেশজুড়ে জরুরি আইন ঘোষণা।
মিসায় বন্দি হলেন কবি, লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা।

১৯৭৬ — মারা গেলেন মাও-সে-তুং।
জয়প্রকাশের গণ-আন্দোলন।
চাসনালা খনি দুর্ঘটনায় ৪০০ জন শ্রমিকের মৃত্যু।

১৯৭৭ — পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট জয়ী হল।
লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে হারিয়ে ক্ষমতায় এল জনতা সরকার।
প্রধানমন্ত্রী হলেন মোরারজি দেশাই। জরুরি অবস্থার অবসান।

দেশকালের এই পরিস্থিতিতে হত্যা আর সন্ত্রাস সকলের মনে যে-ভয় জাগিয়েছিল, যে-স্বপ্ন দেখিয়েছিল তা বিভিন্ন কবির লেখায় ফুটে উঠেছিল। কোনো কাব্যান্দোলন নয়, জীবনের জন্য লড়াই এইসব কবিতাকে সজীব, রক্তাক্ত করেছিল। যেখানে চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাটের কবিরাও কলম ধরেছিলেন। কয়েকজন কবির কবিতাংশ এর সমর্থনে উল্লেখ করছি।

১. *যা লেখো যা ইচ্ছে লেখো কিন্তু খবরদার—*
দিও না সাপের লেজে পা,
বলো না, নরখাদক বাঘ মানুষের মাংস খায়
(বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)

২. *বড়ো বেশি দেখা হলো যা দেখার পাপে শরীরের*
রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভ'রে যায় ত্রাণহীন নীরন্ধ্র কালিমা
(শঙ্খ ঘোষ)

৩. *জেলখানায় অদ্ভুত সেই স্যাঁতসেতে ঘর, মনে পড়ে*
বন্ধুদের, যারা
ভালোবাসতো আশ্চর্য এক বেঁচে থাকার কথাই
শুধু ভাবতে ভাবতে, বাতাসে
যাদের রক্তের গন্ধ
আজ বারুদের গন্ধে মিশে গ্যাছে।
(বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত)

সত্তরের কবিরা আগুনের মধ্যে হেঁটেছেন। তাই তাঁদের কবিতার ভাষা ও ভঙ্গি অন্যরকম।

১. *এক লক্ষ*
এক লক্ষ সজ্জিত মানুষ
উত্তরের পলাশফোটা মাঠে
তাদের,
তাদের বুকের আগুন
নিঙড়িয়ে নিঙড়িয়ে
স্তূপাকার করছে। (কমলেশ সেন)

২. *আমি সমীর, জলকে মাথায় করে বিদ্যুৎ নাচাবো*
প্রভাসনলিনী মা আমার, মা আমার
দেখিস, দেখিস, আমি তোর পুত্র ঠিক হবো।
(সমীর রায়)

৩. *এবার প্রস্তুত কোনো অদ্বিতীয় অতিক্রমে, আমি*
পার হতে হতে সব ঘনিষ্ঠ সংস্থান
মনে হবে সমষ্টির মর্যাদায় ভূষিত, তখনো
দূরতম নক্ষত্রস্পর্শের পরিত্রাণ।
(মণিভূষণ ভট্টাচার্য)

৪. *অন্নের নিটোল গ্রাস আটকে যায়*
গলায় নলীতে
দুধলি ঘাসের বুকে পড়ে থাকে নিহত প্রবীর।
(সব্যসাচী দেব)

৫. *পোস্টার অথবা কবিতা*
যে যা খুশি ভেবে নিতে পারে
আমি চাই কথাগুলো আটটা পাঁচটার গেটে
অনায়াসে মিশে যাক
তেতে উঠুক অবস্থানের তাঁবু।

(পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়)

৬. *ডাকো, যেন মেঘ ডেকে ওঠে*
ডাকে, যেন সমুদ্র গর্জায়
ডাকো, ডাকে যেন বেজে ওঠে শাঁখ।...
দারুণ গভীর থেকে ডাক দাও— মানুষের মা—
ও মাটির মা।

(রঞ্জিত গুপ্ত)

৭. *তবু হাতে থাকে হাতের নির্ভর*
বুকে জাগে উদ্ভিদের স্বর
সভ্যতার গুল্মময় শরীরের পাশে।
কেউ কেউ বাড়ির পথে দীর্ঘযাত্রা শুরু করে
তখন তাদের স্বপ্ন জুড়ে হাওয়া সবুজ ঢেউ তোলে
বিশাল প্রান্তরে।

(তড়িৎ চৌধুরী)

ষাট ও সত্তরের দশক জুড়ে নানা স্বাদের ও নানা বিষয়ের কবিতা লেখা হয়েছে। বর্তমান আলোচনায় শুধু এক বিশেষ ভঙ্গি ও ভাবনাকে দেখানো হল— যা উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে লেখা বাংলা কবিতার পালাবদলের নানা মুদ্রা প্রকাশ করেছে। সাহিত্যিক আন্দোলনগুলি ফলপ্রসূ হল কি না অথবা তার যৌক্তিকতা কোথায়, এমনতরো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ইতিহাসকারেরা করবেন। রবীন্দ্রনাথের পর বাঙালি কবিরা বাংলা কবিতা নিয়ে যে ক্রমাগত ভেবেছেন, ছাঁচ ভেঙেছেন, অন্য কিছু বলতে বা করতে চেয়েছেন, এগুলি তারই নিদর্শন। আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতে এইসব কবিতা নবতর বার্তা ও ব্যঞ্জনা আনতে চায়, এতে সন্দেহ নেই। শাশ্বত কি না, সে-বিচার করবেন মহাকাল।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কবিতায় সমাজমনস্কতা অন্যতম লক্ষণ রূপে চিহ্নিত হতে পারে। মুখ্যত তিরিশের কবিরা চল্লিশে ও উত্তর-চল্লিশে লেখা কবিতায় দায়বদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন, যদিও চল্লিশের বা চারের দশকের কবিরা এ-ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর বলা যায়। জীবনানন্দ দাশের 'সাতটি তারার তিমির' কিংবা 'বেলা অবেলা কালবেলা' কাব্যে দেশকাল ও সমাজসংসক্ত ছবি দুর্লভ নয়।

প্রশান্তিই প্রাণরণনের সত্য শেষ কথা, তাই
চোখ বুজে নীরবে থেমেছি।
ফ্যাক্টরির সিটি এসে ডাকে যদি,
ব্রেন কামানের শব্দ হয়,
লরিতে বোঝাই করা হিংস্র মানবিকী
অথবা অহিংস নিত্য মৃতদের ভিড়
উদ্দাম বৈভবে যদি রাজপথ ভেঙে চ'লে যায়,
ওরা যদি কালোবাজারের মোহে মাতে,
নারীমূল্যে অন্ন বিক্রী করে,
মানুষের দাম যদি জল হয়, আহা,
বহমান ইতিহাসমরুকণিকার
পিপাসা মেটাতে
ওরা যদি আমাদের ডাক দিয়ে যায়— (মৃত্যু স্বপ্ন সংকল্প)

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'সংবর্ত' বা 'দশমী' কাব্যে আত্মগত জগৎ থেকে বাইরে তাকাতে চেয়েছেন। পৃথিবী যখন মুখর 'একনায়কের স্তবে', তখন তাঁর মনে হয়েছে—

অতএব কারো পথ চেয়ে লাভ নেই
অমোঘ নিধন শ্রেয়ো তো স্বধর্মেই
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী— (প্রতীক্ষা)

নিজেকে 'ইতরের কবি' ঘোষণা করে প্রেমেন্দ্র মিত্র সমাজের সমস্যা, দুঃখকষ্ট লিপিবদ্ধ করেছেন। 'হরিণ-চিতা-চিল' কাব্যে ও নামাঙ্কিত কবিতায় সভ্যতার মেকি রূপ ধ্বংস করতে চেয়েছেন। শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে সহমর্মিতায় গড়ে তুলতে চেয়েছেন সেই 'বেনামী বন্দর', যেখানে শুধু হতভাগাদের ভিড়।

মননজীবী ও মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী কবি বিষ্ণু দে বারংবার এই সমাজের দিকে চোখ ফিরিয়েছেন। 'অন্বিষ্ট' কবিতায় দেখান,

তারি মাঝে আসে ওরা
দিনের মজুর দিন আনে হাতে হাতে
রুজির সংঘাতে।

দেখতে পান,

বর-বধূ রোমান্টিক বাসরঘর একালে বদলে গেছে।
শুধু নেই বধূ, নেই, সে গিয়েছে আউশের বিলে,
বর নেই, বর কোথা জগদ্দলে মুনিষ মিছিলে

(রথযাত্রা, ঈদমুবারক)

লালকমল ও নীলকমলকে রূপকথার জগৎ থেকে বিনির্মাণ করেন, সমাজ বদলানোর কাজে। শোষণ ও পীড়নের ছবি অন্যভাবে আঁকেন অরুণ মিত্র—

আর একটু সবুর করো পিয়ারিয়া,
ভালোবাসার কথা ভাবো,
বালবাচ্চা এন্ডিগেন্ডি ভালোবাসা থেকেই এসেছে
মালিক মাল্‌কানি ভালোবাসার মুখ চেয়েই
তোমাকে ভিড়িয়ে দিয়েছেন রাত্তিরে ...

(চারপাইয়ের ওপর)

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে উদ্দীপিত হয়েও খুশি হতে পারেন না। কারণ দেখতে পান,

যার হাত আছে তার কাজ নেই,
যার কাজ আছে তার ভাত নেই,
আর, যার ভাত আছে তার হাত নেই।

(মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও লক্ষ করেন—

আমার ভারতবর্ষ
পঞ্চাশ কোটি নগ্ন মানুষের—

(আমার ভারতবর্ষ)

পঞ্চাশের কবি শঙ্খ ঘোষ সামাজিক সমস্যাকে অন্যভাবে দেখেছেন—

বিকিয়ে গেছে চোখের চাওয়া
তোমার সঙ্গে ওতপ্রোত
নিওন আলোয় পণ্য হলো
যা কিছু আজ ব্যক্তিগত।

(মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে)

তাঁর 'বাবরের প্রার্থনা' সমাজমনস্ক কবির অভ্রান্ত পরিচয় দেয়।

কবিতা নিয়ে তারুণ্যের নতুন মেজাজ নিয়ে এল 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা (১৯৫৩)। মূল কাণ্ডারি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সহযোগী দীপক মজুমদার ও আনন্দ বাগচী। পরে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। 'কৃত্তিবাস' কবিদের অহং ও অভিমানকে গুরুত্ব দিয়েছিল। পত্রিকার উদ্দেশ্য— "তীব্র, উদাসীন, উন্মত্ত, ধীমান, ক্রুদ্ধ, সম্ভ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, শান্ত, বিটনিক, ভয়ঙ্কর, মগ্ন, চতুর, সৎ, ভূতগ্রস্ত, ধার্মিক ও অতৃপ্ত কবিদের ব্যক্তিগত রচনা, কবিতা ও বিস্ফোরণ।" এখানে লিখলেন শঙ্খ ঘোষ, সুধেন্দু মল্লিক, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বিনয় মজুমদার, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পঞ্চাশের সমস্ত কবিকুল। কবিতার ভাষায় কথা বলাই এঁদের উদ্দেশ্য। কাব্যিকতা বর্জিত হল। দৈনন্দিন জীবনযাপন উঠে এল কবিতার উপাদান রূপে। ছন্দ ভাঙা ও গড়ার অপরূপ কৌশল দেখা গেল তাঁদের কবিতায়। যা এই সময়ের তরুণ কবিদের প্রেরণাস্থল হয়ে আছে। যদিও আশি আর নব্বইয়ের দশকের কবিরা সেইভাবে একক মহিমায় উদ্ভাসিত হতে পারেননি। সত্তরের কবিরাই এখন পর্যন্ত পাঠকপ্রিয় হয়েছেন, অন্তত পরিসংখ্যান নিলে প্রমাণিত হবে। সত্তরের কবিদের মধ্যে কিছু পরিচিত মুখ— জয় গোস্বামী, সুবোধ সরকার, মৃদুল দাশগুপ্ত, সুব্রত রুদ্র, রণজিৎ দাশ, ধূর্জটি চন্দ, রমা ঘোষ, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, দেবদাস আচার্য, সুজিত সরকার, শ্যামলকান্তি দাশ প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বড় পত্রিকার আনুকূল্যে যশ-প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তবে কবিপ্রতিভা তাঁদের আছে, মানতেই হবে। জয় গোস্বামীর কবিতায় লিরিকের টান, বিষাদ ও আত্মমগ্নতা পাঠককে স্পর্শ করে। অন্যদিকে সুবোধ সরকারের কবিতায় গল্পাভাস ও প্রতিবাদী মেজাজ আলাদা স্বাদ আনে। জীবনযাপনের ও সমাজের নানা বাঁক স্পর্শ করেন রণজিৎ দাশ, মৃদুল দাশগুপ্ত, রমানাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ কবিরা। এঁদের নানা কণ্ঠস্বরের কিছু নমুনা দেখানো যাক—

১. *যদি জিগ্যেস করো একজন কবির কাজ কী হওয়া উচিত*
কেন তুমি এখনো শেখোনি— তাহলে
আমি শুধু বলবো একটি কণা
বলবো বালির একটি কণা থেকে আমি জন্মেছিলাম,

(জয় গোস্বামী)

২. *জীবনের রূপ ধ'রে মৃত্যু গীয়মান*
নৈঃশব্দ্যের পদধ্বনি চরাচর জুড়ে
সব ঝরাপাতা।

(রমানাথ ভট্টাচার্য)

৩. *দৌড়তে দৌড়তে ঘোড়া একদিন অন্ধ হয়ে যায়*
তুমি কি ফিরবে আর? তুমি কি ফিরবে কোনদিন?
যদি ফেরো, ক্ষণকাল দাঁড়িয়ো যতীন দাস রোডে
অন্ধ ঘোড়ার পিঠে অন্ধ যুবক আমি তোমার আশায়।

(সুবোধ সরকার)

লালকমল ও নীলকমলকে রূপকথার জগৎ থেকে বিনির্মাণ করেন, সমাজ বদলানোর কাজে। শোষণ ও পীড়নের ছবি অন্যভাবে আঁকেন অরুণ মিত্র—

আর একটু সবুর করো পিয়ারিয়া,
ভালোবাসার কথা ভাবো,
বালবাচ্চা এন্ডিগেন্ডি ভালোবাসা থেকেই এসেছে
মালিক মাল্‌কানি ভালোবাসার মুখ চেয়েই
তোমাকে ভিড়িয়ে দিয়েছেন রাত্তিরে ...

(চারপাইয়ের ওপর)

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে উদ্দীপিত হয়েও খুশি হতে পারেন না। কারণ দেখতে পান,

যার হাত আছে তার কাজ নেই,
যার কাজ আছে তার ভাত নেই,
আর, যার ভাত আছে তার হাত নেই।

(মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ)

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও লক্ষ করেন—

আমার ভারতবর্ষ
পঞ্চাশ কোটি নগ্ন মানুষের—

(আমার ভারতবর্ষ)

পঞ্চাশের কবি শঙ্খ ঘোষ সামাজিক সমস্যাকে অন্যভাবে দেখেছেন—

বিকিয়ে গেছে চোখের চাওয়া
তোমার সঙ্গে ওতপ্রোত
নিওন আলোয় পণ্য হলো
যা কিছু আজ ব্যক্তিগত।

(মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে)

তাঁর 'বাবরের প্রার্থনা' সমাজমনস্ক কবির অভ্রান্ত পরিচয় দেয়।

কবিতা নিয়ে তারুণ্যের নতুন মেজাজ নিয়ে এল 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা (১৯৫৩)। মূল কাণ্ডারি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সহযোগী দীপক মজুমদার ও আনন্দ বাগচী। পরে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। 'কৃত্তিবাস' কবিদের অহং ও অভিমানকে গুরুত্ব দিয়েছিল। পত্রিকার উদ্দেশ্য— "তীব্র, উদাসীন, উন্মত্ত, ধীমান, ক্রুদ্ধ, সম্ভ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, শান্ত, বিটনিক, ভয়ঙ্কর, মগ্ন, চতুর, সৎ, ভূতগ্রস্ত, ধার্মিক ও অতৃপ্ত কবিদের ব্যক্তিগত রচনা, কবিতা ও বিস্ফোরণ।" এখানে লিখলেন শঙ্খ ঘোষ, সুধেন্দু মল্লিক, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, বিনয় মজুমদার, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পঞ্চাশের সমস্ত কবিকুল। কবিতার ভাষায় কথা বলাই এঁদের উদ্দেশ্য। কাব্যিকতা বর্জিত হল। দৈনন্দিন জীবনযাপন উঠে এল কবিতার উপাদান রূপে। ছন্দ ভাঙা ও গড়ার অপরূপ কৌশল দেখা গেল তাঁদের কবিতায়। যা এই সময়ের তরুণ কবিদের প্রেরণাস্থল হয়ে আছে। যদিও আশি আর নব্বইয়ের দশকের কবিরা সেইভাবে একক মহিমায় উদ্ভাসিত হতে পারেননি। সত্তরের কবিরাই এখন পর্যন্ত পাঠকপ্রিয় হয়েছেন, অন্তত পরিসংখ্যান নিলে প্রমাণিত হবে। সত্তরের কবিদের মধ্যে কিছু পরিচিত মুখ— জয় গোস্বামী, সুবোধ সরকার, মৃদুল দাশগুপ্ত, সুব্রত রুদ্র, রণজিৎ দাশ, ধূর্জটি চন্দ, রমা ঘোষ, পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, দেবদাস আচার্য, সুজিত সরকার, শ্যামলকান্তি দাশ প্রমুখ। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বড় পত্রিকার আনুকূল্যে যশ-প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তবে কবিপ্রতিভা তাঁদের আছে, মানতেই হবে। জয় গোস্বামীর কবিতায় লিরিকের টান, বিষাদ ও আত্মমগ্নতা পাঠককে স্পর্শ করে। অন্যদিকে সুবোধ সরকারের কবিতায় গল্পাভাস ও প্রতিবাদী মেজাজ আলাদা স্বাদ আনে। জীবনযাপনের ও সমাজের নানা বাঁক স্পর্শ করেন রণজিৎ দাশ, মৃদুল দাশগুপ্ত, রমানাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ কবিরা। এঁদের নানা কণ্ঠস্বরের কিছু নমুনা দেখানো যাক—

১. *যদি জিগ্যেস করো একজন কবির কাজ কী হওয়া উচিত*
কেন তুমি এখনো শেখোনি— তাহলে
আমি শুধু বলবো একটি কণা
বলবো বালির একটি কণা থেকে আমি জন্মেছিলাম,

(জয় গোস্বামী)

২. *জীবনের রূপ ধ'রে মৃত্যু গীয়মান*
নৈঃশব্দ্যের পদধ্বনি চরাচর জুড়ে
সব ঝরাপাতা।

(রমানাথ ভট্টাচার্য)

৩. *দৌড়তে দৌড়তে ঘোড়া একদিন অন্ধ হয়ে যায়*
তুমি কি ফিরবে আর? তুমি কি ফিরবে কোনদিন?
যদি ফেরো, ক্ষণকাল দাঁড়িয়ো যতীন দাস রোডে
অন্ধ ঘোড়ার পিঠে অন্ধ যুবক আমি তোমার আশায়।

(সুবোধ সরকার)

৪. *যদি অহঙ্কার করো, ভেবো না ও মুখপানে ফিরেও তাকাবো*

আর

এখনো প্রচুর ট্রেন উজ্জ্বল স্টেশনে আসে— মনে রেখো—

আমারই উদ্ধারে!

চেয়েছি তোমাকে দেবো নষ্ট প্রতিভার স্বাদ, ঠোঁট থেকে, রোমকূপ থেকে,

যার চেয়ে বেশি নোনা কিছু নেই পুরুষের নারীকে দেবার মতো;

(রণজিৎ দাশ)

ষাটের মতো সত্তরের দশকও কবিতায় ঋদ্ধ। যে-কবিতা শুধু চমক নয়, শব্দক্রীড়া নয়; অনুভবের সত্যে ও জীবনবোধে সঞ্জীবিত।

আশি ও নব্বইয়ের দশকে কবিতার আরেক রূপ প্রকাশিত হল। পূর্বজ কবিদের পদাঙ্ক অনুসরণে এই সময়ের কবিদের যাত্রা শুরু হয়েছে। তবে দেশ-কাল-পরিস্থিতি একেবারে ভিন্নতর। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমুন্নতি ঘটেছে। দূরদর্শনের কল্যাণে শোনা এখন দেখায় পর্যবসিত। পাঠযোগ্যতা শ্রাব্যের ও দৃশ্যের কাছে প্রায় পরাস্ত। আশির দশকের কবিরা দেখলেন—

১. ইন্দিরা গাঁধীর পুনরায় সরকার গঠন ও প্রধানমন্ত্রিত্ব।
২. চাইবাসায় জনসভায় গণহত্যা।
৩. চার্লস-ডায়ানার রাজকীয় বিবাহ।
৪. মহাকাশে প্রথম ভারতীয় রাকেশ শর্মার অভিযান।
৫. অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরে সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশ।
৬. ইন্দিরা গাঁধী দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত।
৭. শ্রীলঙ্কায় যুদ্ধ ও অস্থিরতা।
৮. গুজরাটে দাঙ্গা।
৯. ভূপালে শোচনীয় গ্যাস-দুর্ঘটনা।
১০. ইথিওপিয়ায় দুর্ভিক্ষ।
১১. গোর্খাল্যান্ড আন্দোলন।
১২. বোফর্স-বিতর্ক শুরু।
১৩. চিনে তিয়েনান-মেন স্কোয়ারে ছাত্রছাত্রীদের উপর সেনাবাহিনীর আক্রমণ ও হত্যা।

এই সময়ের কবিদের মধ্যে পাই জয়দেব বসু, জহর সেন মজুমদার, মল্লিকা সেনগুপ্ত, বীথি চট্টোপাধ্যায়, তমালিকা পণ্ডা শেঠ, সুতপা সেনগুপ্ত, বিজয় সিংহ, নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাহুল পুরকায়স্থ, সুমন গুণ, অদীপ ঘোষ, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতেশ মাইতি, নাসের হোসেন প্রমুখ। আশির দশকে মহিলা কবিদের প্রাধান্য ও আত্মপ্রকাশ চোখে পড়ার মতো। কবিতায় নারীবাদী চেতনার প্রকাশও এ-সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আশির কবিরা কীভাবে তাঁদের ভুবন তৈরি করতে চেয়েছেন অথবা কী ভাবতে চান তা কয়েকজন কবির কবিতাংশ উদ্ধৃত করলে হয়তো বোঝা যাবে। যেহেতু এঁদের কবিতা এখনও পরিণামমুখী, তাই শেষকথা বলা সম্ভব নয়। একই কথা বলা যায় নব্বইয়ের কবিদের সম্পর্কেও। এ-কথা ঠিক, এই দুই দশকের কবিরা ছন্দে ও শব্দসজ্জায় নিপুণ; অত্যন্ত স্মার্ট তাঁদের বাগ্‌ভঙ্গি ও কাব্যাঙ্গিক। কিন্তু যা চোখ টানে তা মন টানবে এমন তো নয়। কোনো বিশেষ জীবনদর্শন এঁদের লেখায় পাওয়া দুষ্কর। বিচ্ছিন্নভাবে কোনো পঙ্‌ক্তি, কোনো চিত্রকল্প বা কোনো বক্তব্য পাঠককে চকিতে চমৎকৃত করে।

১. *না উড়েও ওড়া— এ এক চমৎকার রীতি, যা একমাত্র মানুষই পারে*
পায়রারা প্রেম করে, তবে এতখানি উড়তে উড়তে নয়।

(নাসের হোসেন)

২. *ওই মেয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে*
লিপস্টিকে ঢেকেছে কালো ঠোঁট,
লাল রং বেণী, কমলা সবুজ নখ—
বাঘ না ভালুক কে কখন খাবে অপেক্ষায় ...
ওই মেয়ে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ...

(ঈশিতা ভাদুড়ী)

৩. *সপাং চাবুকে ঘুরে দাঁড়াচ্ছি সঙ*
দড়িতে নাচছি লাফাচ্ছি হাত তুলে
সপাং চাবুকে বদলে মুখের রঙ
হা হা হা হাসছি সব ভুলে দিল খুলে।

(শতরূপা সান্যাল)

৪. *নিভৃত ঘর, ঘরের মধ্যে রোজ*
একা তোমার সেই মাধুরীলতা
অশ্রুহীন শুকনো দুটি চোখ
চোখের পাতায় স্থবির নীরবতা।

(বীথি চট্টোপাধ্যায়)

৫. *রহস্যে তোমাকে জানি, চৈত্রপরশে*
বলি : জাগো

কৃপাণ, ক্ষুধার ঢেউ; নীল আত্মহারা
স্মৃতিসহোদরা তুমি
তোমার নিকটে
আজ অতি ধীরে আসি, মন এই চায়।

(রাহুল পুরকায়স্থ)

৬. একটি বাচ্চা মেয়ের মাথার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল রোগা পাঠ্যবইগুলি।
ক্ষ্যাপা হাতির পিঠে বসে লণ্ডভণ্ড পৃথিবী দেখতে দেখতে
ভাবি— এ পৃথিবী সম্পূর্ণ অচল হাতির সুপরামর্শ ছাড়া।

(জহর সেন মজুমদার)

৭. আজকাল প্রতিটা দিন তৈরি হয়
আমাদের নখ তলপেটের আগুন ও স্বপ্ন নিয়ে।
স্বপ্ন ফুঃ।
আমি লাথি মেরে সরাচ্ছি ওসব।

(ধীমান চক্রবর্তী)

৮. রোদের সরল ছায়া উঁচু উঁচু ডালে ও পাতায়।
বাঁশবন, শুকনো পাতা জলে, চারপাশে
মাঠ, মাটির দাওয়ায় দুটি মোরগ,
বিকেল
তোমার দুঃখের মতো নিরুপায় ছড়িয়ে রয়েছে।

(সুমন গুণ)

উৎকলিত কবিতাংশ থেকে পাঠক টের পাবেন আশির কবিরা কোনো বিশেষ ভাবনাবলয়ে আবদ্ধ নন। ঈষৎ ব্যঙ্গ মিশিয়ে জীবন-ও মানুষকে দেখেন নাসের। পণ্যা নারীর বিপন্নতা অথবা নারীজন্মের যন্ত্রণা ফুটে ওঠে ঈশিতা ও শতরূপার কবিতায়। জহর ত্যাজিক রিয়ালিটি নিয়ে আসেন তাঁর কবিতায় এবং অবশ্যই তার ধ্যে মিশে যায় প্রবল সমাজবীক্ষা। যা পাই ধীমানের লেখাতেও। সুমন গুণ ছোট ছোট দৃশ্যরূপে অন্তর্গত ভাব ও ভাবনাকে ব্যক্ত করেন— যা জলরঙে আঁকা ছবির মতো।

আশি বা আটের দশকের কবিদের মানসতা বা কাব্যাদর্শ নী তার সংহত রূপরেখা এঁকেছেন উত্থানপদ বিজলী তাঁর ম্পাদিত "কবিতা : দশক আশি" সংকলনের ভূমিকায়। তাঁর ক্তব্যের অংশবিশেষের উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

আশির দশকের কবিরা সকলেই স্বাধীন ভারতবর্ষের নুষ।... স্বাধীনতা-উত্তরকালের অর্থনৈতিক সংকট ও সামাজিক তিনীতির অবক্ষয়তার মধ্যে এরা সকলেই জন্মগ্রহণ করেছেন ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছেন।... উপলব্ধি করেছেন— স্নেহ-প্রীতির সূত্র অবধারিতভাবে ক্ষীণ এবং প্রেমে অনিবার্য কলুষতা ও বিশ্বাসহীনতা। তাই মনে হয়, তাদের আজ কোন আদর্শকে লক্ষ্য রেখে এগিয়ে যাবার প্রয়োজন অনুভূত হয় না এবং আদর্শের জন্য সংগ্রাম পরিলক্ষিত হয় না।

এই কারণে এই দশকের কবিরা কাব্যপ্রকরণে কোনো ভাঙচুর করেননি। পূর্বসূরিদের চলা পথে হেঁটেছেন। কারও কারও লেখায় স্বাতন্ত্র্য নেই এমন বলা যাবে না। আসলে সামগ্রিক বিচারে দু'একটি কোকিলের ডাকে বসন্ত এসেছে বলা অব্যাপ্তিদোষদুষ্ট হয়ে পড়ে। তবু আশির কিছু বহুশ্রুত নামের কবিদের কবিতাংশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাতে চাই।

১. বুঝে গেছো— বালি দিয়ে দুর্গগড়া জীবনে পবিত্রতম কাজ!
তোমার জীবনে কোনো মাধ্যাকর্ষণের টান নেই!
তুমি কি শেখো নি সেই পূতঃ শিক্ষা অধঃপতনের!

(ঋজুরেখ চক্রবর্তী)

২. ধর্মহীন হতে চাই, অথচ চারপাশে কোনো প্রতিপক্ষ নেই
চৌকাঠের বৃত্ত জুড়ে এক সুর।

(কাজল চক্রবর্তী)

৩. আমার জননীর গোপন যোনিপথে
প্রসবকালে কোন যাদুকরী
মন্ত্রপড়ে বিষ লুকিয়ে ঢেলেছিলো
ডাইনী মেয়ে আমি জন্মেছি

(চৈতালী চট্টোপাধ্যায়)

৪. ঘাসের মধ্যে ডুবে আছে আমার রাইফেল, দু'চোখে সন্দেহ
বিশ্বাস হতে চায় না কিছুই
এই দ্বীপ আর মারাত্মক জীবনের খেলা!

(নাসের হোসেন)

৫. ডেকে গেছে তাকে হেম হাতছানি, প্রেতায়িত গাঢ় দিনশেষ
প্রস্রাব, থুথু, বিষ্ঠা মাড়িয়ে পেতে চেয়েছে সে নিজ দেশ।

(নীলাঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

৬. এসো আমরা পরস্পর আলিঙ্গন করি, তারপর চুম্বন
চুম্বনে কোনো ভাষা লাগে না এবং বড় বেশি ধর্মনিরপেক্ষ

(প্রবালকুমার বসু)

৭. আগে
নিজের একটা আকাশ তৈরি করো
তার নিচে একটা পৃথিবী গড়ো

(শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়)

৮. *শরীর জুড়ে অভিমানের ছন্দ এমন*
বুকের ধূ ধূ আগুন ছুঁতে
দুঃখ এলো তোমার মতন।

(সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায়)

৯. *গরু মানুষ পাখি*
সবাই জমি তৈরির জন্য ঘাম ঝরাচ্ছে।

(রত্নাংশু বর্গী)

১০. *যে মেয়ে কবিতা লেখে, তর্ক করে, বিদগ্ধ, বিদুষী*
যে মেয়েরা ধান বোনে, ইট তোলে, অফিস চালায়
তাদের বর্ণনাযোগ্য শব্দ নেই তোমার কলমে
অর্ধেক বুঝেছ তুমি মহাকবি, মেয়েদের অর্ধেক বোঝনি।

(মল্লিকা সেনগুপ্ত)

সৎ পাঠকমাত্র স্বীকার করবেন, উৎকলিত কবিতাংশগুলি পূর্বজ কবিদের কাব্যবোধ, সমাজবোধ বা আঙ্গিকচেতনার থেকে অভিনব বা অনন্য হয়ে ওঠেনি। মল্লিকার নারীবাদী ভাবনার বলিষ্ঠতাও প্রাতিস্বিক নয়— কবিতা সিংহ থেকে কৃষ্ণা বসু, তসলিমা নাসরিন পর্যন্ত যা উদ্‌ভাসিত। বলার ভঙ্গি হয়তো ঈষৎ নতুন। অর্থাৎ বলতে চাই, আটের দশক বা আশির কবিরা বাংলা কবিতায় নতুন রক্ত সঞ্চারিত করেননি। একই সিদ্ধান্ত নব্বইয়ের কবিতা প্রসঙ্গেও বলা যায়।

নয়ের দশক বা নব্বইয়ের কবিদের কাব্যভাবনা কী তাঁরা নিজমুখে যতটা বলেছেন, এই প্রসঙ্গে তার উল্লেখ গুরুত্বপূর্ণ।

পৌলোমী সেনগুপ্ত: কাকে যে কবিতা বলে, কাকে বলে না, তা আজ পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারলাম না।

সাম্যব্রত জোয়ারদার : কবিতা লিখে আমি কারও সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি।

সব্যসাচী ভৌমিক: কোনওভাবেই কবি যা তার প্রতিফলন ঘটছে না তার কবিতায়। যা প্রতিফলিত হচ্ছে তা হল নিজবোধের কোনও বিকৃত উপস্থাপনা কিছু নির্দেশিত তত্ত্বের প্রেক্ষিতে।

রূপক চক্রবর্তী : যা খুশির নাম, যেভাবে খুশি কাটানোর নামই কবিতা।

সেবন্তী ঘোষ: পরিষ্কার করে জানাবার মতো আমার কোনও স্থির নির্দিষ্ট কবিতাভাবনা নেই।

বিভাস রায়চৌধুরী : জয় গোস্বামীর লম্বা ছায়া গায়ে মেখেছে বেশির ভাগ বন্ধু,... এভাবেই মৃদুল, শ্যামলকান্তি, রণজিৎ, সুবোধদের প্রভাব... আমরা নব্বইয়ের কবিতায় ইচ্ছেমতো ব্যবহার করেছি তাদের প্রভা।

বীথি চট্টোপাধ্যায়: এই সময়ের বাংলা কবিতায় বিশেষভাবে ফিরে এসেছে ছন্দ।... এই সময়ের কবিদের ভাষাশৈলী সহজ। এই সময়ের কবিদের মধ্যে আত্মাভিমানের থেকে আত্মপ্রত্যয়ই যেন বেশি।

যশোধরা রায়চৌধুরী : লিখতে লিখতে লেখা হয়েছে। সেজন্য দায়ী এই ধরা ছোঁয়ার পৃথিবীরই কয়েকটি ঘটনা, ফ্যাক্টর, মানুষ। আর কবিতা লেখা না হলেই বা কী হত? কার কী আসত যেত?

(সূত্র : অভিভব/ডিসেম্বর, ২০০১)

নব্বইয়ের কবিদের এই কাব্যচিন্তাই প্রমাণ করে, তাঁরা 'স্থির বিষয়ের দিকে' যেতে পারেননি। হাতে শব্দ, ছন্দ আছে, অতএব কবিতা লিখে ফেলা যাক। প্রমথ চৌধুরীর পরিহাসোক্তি মনে পড়ে—

প্রিয় কবি হতে চাও, লেখো ভালোবাসা
যা পড়ে গলিয়া যাবে পাঠকের মন।
তারি লাগি চাই কিন্তু দুটি আয়োজন
দরকারী ভাব আর সরকারী ভাষা।

ছন্দে নৈপুণ্যই যদি কবি হওয়ার বড় গুণ ও শর্ত হয়, তো সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে সে-সম্মান দিতে হয়। নব্বইয়ের কবিদের আলাদা করে বাহবা কেন দেব? কবিতায় ইতর রসিকতা বা অশ্লীলতার আমদানি পাই কবিওয়ালা থেকে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়। এঁরা ইতিহাসের অন্তর্গত হয়েছেন; ইতিহাস রচনা করেননি মনে রাখতে হবে। নব্বইয়ের কবিদের অধিকাংশই চপলতা, চটুলতাকে প্রকাশভঙ্গির অনন্য পন্থা ভেবেছেন। কবিতার ভাব ও আদর্শ তাতে জলাঞ্জলি গেলেও ক্ষতি নেই। অবশ্য এ-ব্যাপারে সৎ পরামর্শ দিতে গেলে পিনাকী ঠাকুরের মতো কবিরা বিদ্রুপ করবেন— "এইরকম ফতোয়া-দেওয়া লেখকরা কিন্তু আমাদের যৎসামান্য লেখা নিয়ে স্পষ্ট কোনও আলোচনা করছেন না।" তিনি জানতে চান কোথায় তাঁদের ত্রুটি বা নিজস্বতা। যেটুকু আলোচনা করেছি তাতে নিশ্চয় এ-প্রসঙ্গ ব্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলি, নব্বইয়ের কবিদের তালিকায় দু'চার জন কবির অনুপ্রবেশ বেশ অস্বস্তিকর। অন্তত আশির কবি হলে মানিয়ে যেত। কেননা এঁদের জন্মসাল ১৯৫৭, ১৯৫৯, ১৯৬৩, ১৯৬৪-এর মধ্যে। এঁরা যদি নব্বইয়ের দশকের দাবিদার হন,

সে-ক্ষেত্রে মনে হয় তাঁরা শিং ভেঙে বাছুর হতে চান।

আমরা নিশ্চয় এ-কথা বলি না, এ-কালের কবিরা পাঁচালি লিখবেন। স্মার্টনেস কবিতাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। কিন্তু ভঙ্গি যদি চোখ ভোলাতেই ব্যস্ত হয়, তাৎক্ষণিক চমক তৈরি করে, তখন তার স্থায়িত্ব ও গভীরতা নিয়ে সংশয় জাগে। কবিতায় নতুন কিছু আর বলার নেই— সেই মানুষ, প্রেম, কাম, গাছ-ফুল-পাখি-নদী— বারে বারে ব্যবহৃত হয়েছে, বলেছিলেন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাহলে কেন কবিতা লেখা? নতুন করে ও নতুন ভাবে বলার জন্য, লেখার জন্য কবিতা লেখা ও পড়া। নতুনত্বের দাবি সর্বদা স্বাগত। নতুন হওয়ার ঝোঁকে ম্যানারিজ্‌ম বা ভাঁড়ামি এলে ভালো লাগে না। ভালো লাগে না কবিতার রহস্যকে ভেঙে দেবার শস্তা আয়োজনও। জল ফুরোলে পাঁক নিতে হয়, আধুনিক কবি ও কবিতা সম্পর্কে তিনের দশকে রবীন্দ্রনাথই বলেছিলেন। এখনকার কবিরা সেই সতর্কবাণী মনে রাখেননি। ফলে, পাঠকপ্রিয় হতে, পুরস্কার ও বাহবা পেতে ফাস্ট ফুডের মতো মুচমুচে ও চট্‌জলদি কবিতা লেখেন। শোনা বা পড়ামাত্র ভালো লাগে, মনে হয় 'বাহ্, বেশ তো।' তারপর? — 'শুধু ধূলি, শুধু ছাই/মূল্য তার কিছু নাই'। মূল্য সমর্পণ করার প্রতিভার অভাব অনুভূত হয়। তখনই মনে হয় কবিতার দুর্দিন এসে গেল। পরিশ্রম নেই, ভাবনা নেই, উদ্দেশ্য বা আদর্শ নেই— আঁতলামি আছে, সব কিছু নস্যাৎ করার হিরোশিপ আছে, নিজের সম্পর্কে মাত্রাতিরিক্ত গর্ব ও উচ্চ ধারণা আছে। গোষ্ঠীবাজি করে পুরস্কার পাওয়ার সুযোগ আছে। ইহজীবনে আর কী চাওয়ার ও পাওয়ার থাকতে পারে? এখন তো 'কবি' বানানো হয়। হওয়ার জন্য সাধনার দরকার নেই। দরকার যোগাযোগ, লাইন বা চ্যানেল। সবার উপরে আছে বাজারি পত্রিকা গোষ্ঠীর আনুকূল্য। কে লেখক, কে কবি, কে পণ্ডিত, কে সমালোচক হবেন তার নির্ধারক তাঁরাই। বুদ্ধিমান যারা, তারা জানে, এই বিশেষ সংস্থাকে ধরতে হয়, নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়। ফলে, পশ্চিমবাংলার বাইরে যাঁরা বাংলাভাষায় কবিতা লিখছেন, তাঁরাও আর আলোকিত হন না।

প্রসঙ্গত বলি, নব্বইয়ের কবিদের কোনোভাবে আঘাত বা অসম্মান করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি চাই, তাঁদের ভিতরে যে প্রতিভা ও ক্ষমতা আছে তা গড্ডল প্রবাহে যেন ভেসে না-যায়। তাঁরা যেন মনে রাখেন, কোনো ইডিয়োলজি/ভাবাদর্শ ছাড়া কোনো কবিই বড় হতে পারেন না; স্মরণীয় হতে পারেন না। অডেন যতই বলুন 'স্মরণীয় উক্তি' রচনাই কবির কাজ, তা আংশিকতা দোষে দুষ্ট। এমন-কি এজরা পাউন্ড যখন মনে করেন, একটি সার্থক ইমেজ রচনা করাই কবির কাজ, তাও সর্বথা মান্য নয়। সমগ্রতাই সর্বদা কাম্য। কিছু কবি খণ্ডতার উপাসক হয়ে কীভাবে কবিতাকে লঘু ও আপাত চমৎকারিত্বের কোঠায় বন্দি করছেন তার দৃষ্টান্ত দিই।

১. *প্রলয়পয়োধিজলে কে প্রথম কার ঠোঁট কোথায় খুঁজেছি তারপর?*
দে পাড়ার টেঁপি তুমি, বোস পাড়ার লাল্টু হ্যায় হম্
মাথায় পক্ষিণী বসে, প্রজাপতি বলে যান : ঘর
(পিনাকী ঠাকুর)

২. *ওপরে তাকাও, বসন্ত এসে গেছে*
বাঁশি ফেলে দিয়ে সিটি দাও স্মার্ট কবি
ফার্স্ট ইয়ারের হিস্ট্রি অনার্স ব্যাচে
গ্রিটিংস খুলেই হেসে ফেলে বান্ধবী।
(শিবাশিস মুখোপাধ্যায়)

৩. *এই নারীদেহে শব্দ লুকানো যত*
আছে বিশিষ্ট শব্দব্রহ্ম স্থান,
উরুমূলে, নাভি, বক্ষে, জিহ্বাপ্রান্তে
তুমি তাদেরকে করো কবিতার মতো।
(বীথি চট্টোপাধ্যায়)

৪. *এখন শুধু অভিধানেই 'ভ্যাকেন্সি'*
পানের পিকে পাড়ার দেয়াল অজন্তা
ভিড়ে ধাক্কা, পেছন থেকে 'বোকাচ্চো'—
নন্দনে শো, আমার ভুবন, মৃণাল সেন...
(শ্রীজাত)

৫. *ঘুরে মরে কানামাছি*
টানেলে দাঁড়িয়ে আছি
তোমাকে ভিতরে টেনে আঁধারে মিলিয়ে গেল মেট্রো
স্টেশনে রইল পড়ে মৃত সম্পর্কের রেট্রো
লাস্ট মেট্রো।
(বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়)

৬. *তাহলে? তাহলে? স্বপ্ন কয়—*
হ্যাঁ, চলো ঝাঁপিয়ে পড়ি জলে,
মাত্রাছাড়া জোছনা এলো দেশে
চলো প্রেম করি ফলিডলে

(বিভাস রায়চৌধুরী)

এই কবিদের হাতে শব্দ ও ছন্দ এবং ভাব আছে। কিন্তু নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই। প্রভাত চৌধুরী ঠিকই বলেছেন, "এরা ঠিক স্বপ্নচারী নয়, এরা যেন-বা স্বপ্নলোকের শিকারী। এরা অপেক্ষা করে না।" (দ্র. অমৃতলোক, শারদ ১৪০২)। যদিও তিনি অন্ধের মতো এঁদের বাহবা দিয়ে গেছেন। যেমন 'অভিভব' পত্রিকায় আরেক সমালোচক বলেন, "বস্তুত তত্ত্বকে মাথায় রেখে কবিতা লেখা নব্বইয়ের ধাতে নেই।" তত্ত্ব থাকতেই হবে এমন নয়; কবিতার সত্য তো দরকার। অবশ্য এই নব্বইয়ে কিছু কবি আছেন যাঁরা মগ্ন হয়ে নিজের মতো লিখছেন। গিমিক-এ গা ভাসাননি। ভরসা করি সেইসব 'সিরিয়াস' কবিরা কবিতার সুদিন ফিরিয়ে আনবেন। কবিও স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হবেন। আধুনিকতা, উত্তর-আধুনিকতা ইত্যাদি আঁধি পেরিয়ে যথার্থ কবিতা লেখা হোক, চাই। বিশ্বাস করি, বাংলা কবিতা জীবন্ত, চলমান। জীবদেহের মতো তারও বিবর্তন প্রত্যাশিত। শর্ত একটাই : তাকে কবিতাই হতে হবে। ❑